প্রথম অধ্যায়

মনোজ বসুর জীবনী সূত্র

মনোজ বসু ১৯০১ সালের ২৫শে জুলাই যশোহর জেলার কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামের বিখ্যাত বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামলাল বসু, মাতা বিধূমুখী দেবী। পিতামহের নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বসু। মনোজ বসু ছিলেন তিনভাই-বোনের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং একা ভাই। গ্রামে তাঁদের বংশ গৌরব ও খ্যাতি থাকলেও বিষয়-সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় তা তাঁদের ছিল না। মনোজ বসুর পিতা রামলাল বসুরা ছিলেন দুই ভাই। অন্য ভাইয়ের নাম সীতানাথ বসু।

মনোজ বসুর একটি বংশলতিকা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

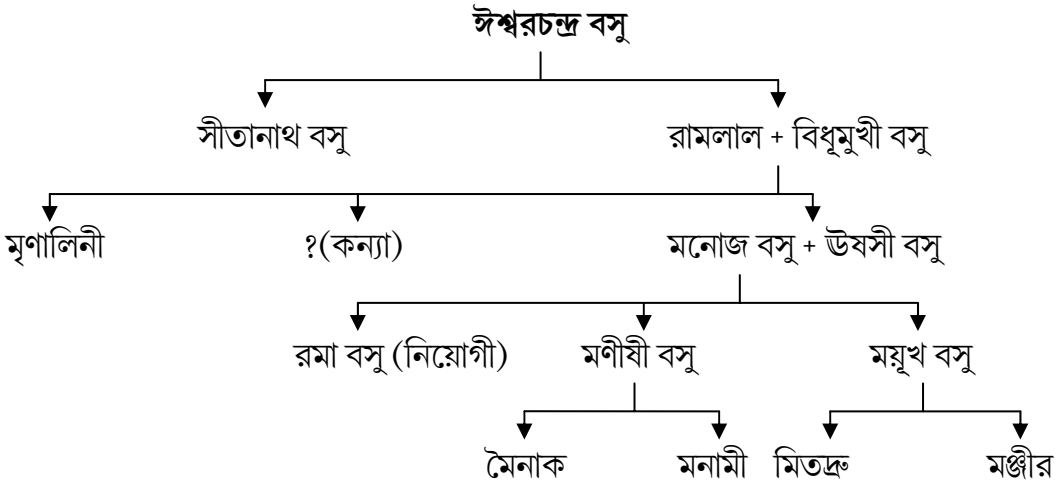

মনোজ বসুর ঠাকুরদাদার লেখার অভ্যাস পিতা রামলালের মধ্যেও ছিল। দুই পুরুষের সাহিত্যচর্চার সঞ্চয় ছিল মনোজ বসুর লেখক হওয়ার পাথেয়। পিতার সাহিত্যানুরাগ, দেশপ্রেম, দৃঢ়ব্যক্তিত্ব বালক বয়স থেকেই সঞ্চারিত হয়েছিল লেখক মনোজ বসুর মধ্যে। মনোজ বসুর কথায় —

> "লেখার দুর্মতি কি করে এলো শুনুন সেই গল্প। বাবা অল্প-স্বল্প লিখতেন। ঠাকুরদাদার হাতে লেখা বড় কেতাব অতি শৈশবে দেখেছি, — নিজের রচনা অথবা

> অন্যের কিতাব নকল করা — সঠিক বলতে পারব না। অতএব লেখার বীজ ছিল রক্তের মধ্যেই।"[১]

লেখকের বয়স তখন সাত একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মনোজ বসু কবিতা লিখতে শুরু করেন। লেখকের কথায় -

> "বাবা বললেন, ও ঘর থেকে বঙ্কিমবাবুর বইখানা আনতে। কে এই বঙ্কিমবাবু? বই লিখেছেন, মারা গিয়েও বেঁচে আছেন তিনি। দেশ জোড়া নাম । মুহূর্তে সাব্যস্ত করে ফেললাম। আমিও বই লিখব, সকলে নাম করবে। ক্রিয়া অমনি সংগে সংগে। তক্ষুনি বসে গেলাম কলম নিয়ে। কবিতায় একটা সুবিধে ছোট হলেও ক্ষতি নেই, তাই কবিতা শুরু করলাম। ওরে বাবা, তরু-মরু-সরু-নরু কর গুণে গুণে মিল খুঁজতে প্রাণান্ত। সমস্তবেলা ধরে চারটে লাইন দাঁড়াল। সেই আমার প্রথম লেখা।"[২]

মনোজ বসুর বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই প্রহ্লাদ মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। কাকা সীতানাথ এঁদের দেখাশোনা করতেন। স্থানীয় পাঁজিয়া গ্রামে প্রাথমিক পড়া শেষ করে ভর্তি হন পাঁজিয়া হাইস্কুলে। রাস্তা-ঘাট কাঁচা। খালি পায়ে হাঁটা-চলা করতেন। স্কুলে যেতেন। যা হয়তো আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে অসম্মানের ব্যাপার। গরমের দিনে ভোর রাতে লেখকের মা ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে দিতেন। সাজিয়ে গুছিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। তখন লেখকের বয়স বড়জোর দশ বা এগারো বছর। এই পাঁজিয়া স্কুলে মনোজ বসু ৫-৬ বছর পড়েছিলেন। অষ্টম শ্রেণি পাশ করে মনোজ বসু কলকাতায় চলে আসেন উচ্চশিক্ষার জন্য। সাল ১৯১৬ অথবা ১৯১৭। মনোজ বসুর নিজের কথায় —

> "গ্রামের স্কুলে ভাল পড়াশোনা হতো না। উঁচু ক্লাসে পড়ানোর ভাল শিক্ষক ছিল না। ছাত্রও মিলত না। তাই কলকাতা আসা স্থির করলাম।"[৩]

কলকাতায় লেখকের বাবার এক বন্ধু তাঁকে নিয়ে এসে আর্য মিশন ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু এখানে তিনি মানিয়ে নিতে পারলেন না। ভর্তি হলেন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে।

অভাব অনটন আর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে ১৯১৯ সালে তিনি কয়েকটি বিষয়ে লেটার সহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তীব্র আর্থিক সংকটের কথা ভেবে নব প্রতিষ্ঠিত খুলনার বাগেরহাট কলেজে তিনি ভর্তি হন। অর্থাভাব থাকায় বিজ্ঞান নিয়ে পড়েননি। বাগেরহাট কলেজে কলা বিভাগে পড়ার সময় তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আই. এ. পরীক্ষার ফি দেওয়া বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এক বছর পর ১৯২২ সালে আই.এ. পাশ করেন। পরে আর রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেননি। তবে বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন।

আই. এ. পাশ করে বি.এ. পড়ার জন্য কলকাতার সাউথ সুবারবন কলেজে (বর্তমান নাম আশুতোষ কলেজ) ভর্তি হন। আর্থিক সংকটের কারণে টিউশনি শুরু করেন। এমনই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাউথ সুবারবন কলেজ থেকেই ডিস্টিংশন নিয়ে ১৯২৪ সালে বি. এ. পাশ করেন। এরপর শুরু করলেন আইন পড়তে। এই সময় সাহিত্যিক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে সহপাঠীরূপে পেলেন। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় আইন পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র ২৪ বছর বয়সে অর্থ রোজকারের জন্য স্কুল শিক্ষকতার পথ বেছেনিলেন। পাশাপাশি চলল উদয়াস্ত টিউশনি।

> "বি.এ. পাশ করে মাষ্টারি জুটিয়ে নিলাম একটা। ... ক্লাসে ক্লাসে টোপ ফেলে ট্যুইশনি ... গেঁথে ফেললাম সাত - আটটা। বিদ্যাদানের অষ্টপ্রহরী মচ্ছব চলল, ভাবতে গিয়ে আঁতকে উঠি এখন। শেষ রাতে আকাশে শুকতারা এবং রাস্তায় গ্যাসের আলো - আমার পয়লা ট্যুইশানি তখনই শুরু হয়ে গেছে। চলল একের পর এক ছুটোছুটি এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি।"[৪]

তিনি শিক্ষকতা করেছেন ১৯২৪ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। লেখকের কথায় —

> "কলেজ পড়া সেরেই ঢুকি। বেরিয়ে এলাম তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছি। যৌবনের প্রতিটা মধুভরা দিনমানের অপমৃত্যু ঘটেছে কোলকাতার একটি স্কুলের চতুঃসীমার মধ্যে। ছিলাম জনৈক সাধারণ মাষ্টার। মাইনে চল্লিশে শুরু। বিশ বছর পর আশি ধরো ধরো করেছিল। ... বিদ্যালয় না মানুষ গড়ার কারখানা।"[৫]

এই স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাস।

কর্মজীবনের শুরুতেই যোগ দিলেন ভবানীপুর সাউথ সুবারবন বিদ্যালয়ে। এই সময় থেকেই ছাত্র পড়ানোর পাশাপাশি তিনি স্কুলে পাঠ্যপুস্তক লেখার কাজে মন দেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পর সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষকতার পেশা ছাড়লেন। অদম্য উদ্যম নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তিনি পাঞ্জা লড়েছেন। এই সংগ্রামী ক্ষমতায় মনোজ বসুর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল অপরাজেয় মনোভাব। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন প্রায়চল্লিশ বছর পর্যন্ত। কিন্তু শত প্রলোভনেও সাহিত্য সাধনা ত্যাগ করেননি। লেখকের ভাষায় —

> "অভাব-দুঃখের মধ্যে ফেলে বিধাতা পুরুষ বিস্তর মেহনত করেছিলেন বীজটুকু নিঃশেষ করে দিতে। পারেন নি। মনের তলে চাপা ছিল। সুযোগ এতটুকু পেয়েছে কি অঙ্কুরোদ্গম্।"[৬]

স্কুলে পড়ার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর তিনি 'বিকাশ' নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় লেখকের 'গৃহহারা' (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) গল্পটি প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম মুদ্রিত হয় মনোজ মোহন বসু। 'বাঁশরী'র পৃষ্ঠাতেও ঐ নামে তাঁর আত্মপ্রকাশ। পরে নামের সঙ্গে যুক্ত মোহন পদটি বাদ দেন। 'নতুন মানুষ' (বিচিত্রা, কার্ত্তিক, ১৩৩৭) মনোজ বসুর প্রথম পদক্ষেপ হলেও 'বাঘ' (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবাসী পত্রিকা, ১৩৩৮ বৈশাখ) গল্পের মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে তিনি মোটামুটি ভাবে সাহিত্যিক খ্যাতির অধিকারী হন। এই যশোলাভের নেপথ্যে ছিলেন কল্লোলের সুখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বাগচী এবং অন্যজন সুবল মুখোপাধ্যায়। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (বিধান সরণী) 'বাগচী এন্ডসন্স' এর বইয়ের দোকানে কয়েকজন লেখক আড্ডা দিতেন। মনোজ বসু সেখানে প্রায়ই যেতেন। একদিন তিনি গল্প পাঠ করেন 'বাগচী এন্ডসন্স' এর আড্ডায়। লেখনীর শিল্প কুশলতাও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সাহিত্যিক সুবল মুখোপাধ্যায় প্রতিভার প্রশংসা করে গল্পের আসল নাম 'পিছনের হাতছানি' পরিবর্তন করে 'নতুন মানুষ' নামকরণ করেন। সকলের উৎসাহও প্রশংসায় তৈরী হল আত্মপ্রকাশের সুগম পথ। লেখক ডাকযোগে 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বাঘ', 'নতুন মানুষ' ও 'রাত্রির রোমান্স' গল্প তিনটি পাঠিয়ে দেন।

লেখাগুলি লেখককে সাহিত্যিকের শিরোপা পরিয়ে দিল। স্মৃতিচারণা করে মনোজ বসু লিখেছেন —

> "উপেনদার ('বিচিত্রা' - সম্পাদক – উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) পিঠ চাপড়ানিতে আমি তো ধরাকে সরা জ্ঞান করছি তখন। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। ... নতুন লেখককে সাহিত্য ব্যাধি কঠিন করে ধরল।"[৭]

'প্রবাসী'ও অনুরূপভাবে বরণ করে নিল লেখককে।

> "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তড়াক করে উঠে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। ... আড্ডার মুরুব্বি অশোক চট্টোপাধ্যায় বজ্রমুষ্টিতে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেবিলের পাশে বসিয়েদিলেন। ... অর্থাৎ লেখক রাজ্যে অভিষেক হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।"[৮]

এছাড়া মনোজ বসুর 'গোপন কথা' (হেমলতা দেবী সম্পাদিত মেয়েদের কাগজ 'বঙ্গলক্ষী'তে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে মুদ্রিত) কবিতা কবি জসীমউদ্দিনকে মুগ্ধ করেছিল। মনোজ বসুর ভাষায়—

> "জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) কবি হিসেবে তখন খুব নাম করে ফেলেছেন। একদিন আমি বসে আছি, জসীম এসে আমার নাম ধরে খোঁজ করছে, উমুক কবি কে বলো দিকি ? থাকেন কোথায় ? চেনো নাকি ? আমার একটি কবিতা কোথায় ছাপার অক্ষরে পড়েছে। ভীষণ ভালো লেগেছে তার। যাকে পাচ্ছে শোনাচ্ছে এবং সারা কলিকাতায় কবিকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী উল্লাস আমায় পেয়ে।"[৯]

গুরুসদয় দত্তের (১৮৮২-১৯৪১) পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ১৩৩৭ সনে বীরভূমে পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে মনোজ বসু ও জসীমউদ্দীন ছিলেন সমিতির দুই প্রধান যুগ্ম সম্পাদক। সমিতির কার্যোপলক্ষে মনোজ বসুকে অনেক গাঁয়ে ঘুরতে হয়েছে। পরিভ্রমণকালে তিনি বাংলাকে দেখেছেন, পেয়েছেন গ্রামীণ মানুষের সান্নিধ্য, সাহচর্য, ভালবাসা ও আতিথেয়তা। সঞ্চয় করেছেন বাস্তবজীবন অভিজ্ঞতা এবং আহরণ করেছেন বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

ঔপন্যাসিক রূপে মনোজ বসু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই নাট্যকার রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'প্লাবন' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) নাটক প্রকাশিত হওয়ার দু'বছর পরে প্রথম উপন্যাস 'ভুলি নাই' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। 'ভুলি নাই' ও 'নতুন প্রভাত' (নাটক) রচনার জন্য মনোজ বসু ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন।

সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সাত-আট বছর পরে খুলনা জেলার কাটিপাড়া গ্রামের জমিদার বংশের মেয়ে ঊষসী বসুকে বিয়ে করেন। স্ত্রী উষসী ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। যদিও লেখক নিজে ছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী। বিয়ের পর ভবানীপুরে থাকতেন ভাড়া বাড়িতে। পরে কালীঘাটের মনোহর পুকুর রোডের কাছে ছোট একটা দোতলা বাড়ি কেনেন। এইসময় ছাত্র পড়ানোর পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চায় মন দেন। বই প্রকাশনার জন্য গৌরীঘোনা ইউনিয়নের আগরহাটি গ্রামের জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে মনোজ বসু যৌথভাবে 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' (আনুমানিক ১৯৪৩ সাল) নামে ছাপাখানা গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠানে যখন আয় বাড়লো তখন তিনি শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে মনোজ বসুর মানসিক অবস্থা বিধ্বস্ত হয়। নিজদেশে পরবাসী হয়ে পড়েন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করলো। যে তত্ত্ব ও দর্শন মানুষকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য করে সে তত্ত্বের অসারতা নিয়ে তিনি লিখলেন — 'রক্তের বদলে রক্ত', 'মানুষ নামক জন্তু', 'মৃত্যুর চোখে আগুন' এবং 'পথ কে রুখবে?' নামক উপন্যাসগুলি। তিনি দেশ ভাগের জন্য অদূরদর্শী, স্বার্থান্বেষী ভারতীয় নেতাদের দায়ী করলেন।

১৯৫০ সালের পর তিনি চীন, রাশিয়া, জার্মান, ইংলণ্ড, প্যারিস, বেলজিয়াম ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীগুলি লেখকের ব্যক্তিমনের স্পর্শে সঞ্জীবিত। 'চীন দেখে এলাম', 'সোভিয়েতের দেশে দেশে', 'নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ', 'পথ চলি', 'ঝিলিমিলি' প্রভৃতি ভ্রমণ কাহিনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রোমাণ্টিক ভাবধর্মী শিল্পী মানস ভ্রমণ কাহিনীকে বস্তুসর্বস্ব করেনি, শিল্প-কৌতুহল, সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্য জিজ্ঞাসা ইত্যাদি অনুভূতির রসে মধুস্বাদী করে তুলেছে।

জীবনের দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও মনোজ বসুর সাহিত্যচর্চা থেমে থাকেনি। জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে সাহিত্য চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে 'আমি সম্রাট', 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ',

‘নিশিকুটুম্ব’, ‘বন কেটে বসত’ প্রভৃতি উপন্যাসে। মনোজ বসুর পূর্ণাঙ্গ রচনাসম্ভার নিম্নে তুলে ধরা হল।

গল্পগ্রন্থ (মোট ১৯টি) : বনমর্মর-১৯৩২, নরবাঁধ-১৯৩৩, দেবী কিশোরী-১৯৩৪, একদা নিশীথ কালে-১৯৪২, দুঃখ নিশার শেষে-১৯৪৪, পৃথিবী কাদের-১৯৪৮, উলু-১৯৪৮, খদ্যোত-১৯৫০, কাঁচের আকাশ-১৯৫০, দিল্লী অনেক দূর-১৯৫১, কুঙ্কুম-১৯৫২, কিংশুক-১৯৫৭, মায়াকন্যা-১৯৬১, গল্প পঞ্চাশৎ-১৯৬২, কল্পলতা-১৯৬৬, ওনারা-১৯৬৯, ওস্তাদ নটবর-১৯৭৪, রোমাঞ্চ বনে বনে-১৯৯৯, রাজার ঘড়ি-১৯৯৯।

নাটক (মোট ৮টি) : প্লাবন-১৯৪১, নতুন প্রভাত-১৯৪৩, বিপর্যয়-১৯৪৮, রাখিবন্ধন-১৯৪৯, শেষ লগ্ন-১৯৫৬, বিলাস কুঞ্জ বোর্ডিং-১৯৫৬, ডম্বরু ডাক্তার-১৯৬২, ডাক বাংলো-১৯৬৯।

উপন্যাস (মোট ৩৫টি) : ভুলি নাই-১৯৪৩, সৈনিক-১৯৪৫, ওগো বধূ সুন্দরী-১৯৪৬, শত্রুপক্ষের মেয়ে-১৯৪৬, আগষ্ট ১৯৪২-১৯৪৭, বাঁশের কেল্লা-১৯৪৮, নবীন যাত্রা-১৯৫০, জলজঙ্গল-১৯৫২, বকুল-১৯৫২, এক বিহঙ্গী-১৯৫৪, সবুজ চিঠি-১৯৫৬, বৃষ্টি বৃষ্টি-১৯৫৭, আমার ফাঁসি হল-১৯৫৮, মানুষ নামক জন্তু-১৯৫৯, রক্তের বদলে রক্ত-১৯৫৯, রূপবতী-১৯৬০, বন কেটে বসত-১৯৬১, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-১৯৬১, নিশিকুটুম্ব-১৯৬৩, স্বর্ণসজ্জা-১৯৬৪, ছবি আর ছবি-১৯৬৫, সাজবদল-১৯৬৫, চাঁদের ওপিঠ-১৯৬৬, সেতুবন্ধ-১৯৬৭, রাণী-১৯৬৭, পথ কে রুখবে ?-১৯৬৯, প্রেমিক-১৯৭০, মানুষ গড়ার কারিগর-১৯৭০, আমি সম্রাট-১৯৭১, প্রেম নয় মিছে কথা – ১৯৭২, হার মানিনি, দেখ -১৯৭৩, মৃত্যুর চোখে আগুন-১৯৭৪, সেই গ্রাম,সেই সব মানুষ-১৯৭৫, থিয়েটার-১৯৭৮, খেলাঘর - ১৯৮২।

ভ্রমণ কাহিনী (মোট ৪টি) : চীন দেখে এলাম-১৯৫২, পথ চলি-১৯৫৬, সোভিয়েতের দেশে দেশে-১৯৫৭, নতুন ইয়োরোপ নতুন মানুষ-১৯৫৯।

গদ্যরচনা (মোট ১টি) : ঝিলমিল-১৯৬৯।

সাহিত্য কর্মের জন্য মনোজ বসু আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৬ সাল), নরসিংহ পুরস্কার (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত), শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত), মতিলাল ঘোষ পুরস্কার (অমৃতবাজার প্রদত্ত) শরৎ পুরস্কার (শরৎ স্মৃতি সমিতি প্রদত্ত, ১৯৮৬) - এ তিনি

ভূষিত হন। জগৎও জীবনের রূপকার লেখক মনোজ বসু তাঁর লেখনিতে বিচিত্র রামধনু এঁকেছেন ও সৃষ্টি করেছেন রোমাণ্টিক সাহিত্য জগৎ।

"দেড় শতাধিক গল্প উপন্যাসের তিনি প্রণেতা।"[১০]

সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মনোজ বসু অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠকের মনের মণিকোঠায় স্থান পেয়েছেন। দেশ বিভাগের পর মনোজ বসু তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে যাওয়া কমিয়ে দেন। ১৯৮৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মনোজ বসুর ইচ্ছা ছিল তাঁর শেষকৃত্য যেন ডোঙাঘাটা গ্রামে সম্পন্ন হয়, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয়নি।

তথ্যসূত্র

১. মনোজবসুর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার - বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., নবম সংস্করণ – ২০০৮, পৃ. ১

২. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - সম্পাদক হাসেম আলি ফকির, মার্চ ২০০৫, পৃ. ৬

৩. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৪. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৫. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

৬. মনোজবসুর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার - পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৭. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - ড. দীপকচন্দ্র, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি., আশ্বিন ১৪০৮, পৃ. ১৫

৮. মনোজ বসু জীবন ও সাহিত্য - পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

৯. মনোজ মেলা স্মরণিকা ২০০৫ - পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১০. সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধান - সম্পাদক অঞ্জলি বসু, তৃতীয় সংস্করণ – ২০০৫, পৃ. ২৫৩